Chacha Kahini by Syed Mujtoba Ali

suman_ahm@yahoo.com

চাচা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

মা-জননী

যুদ্ধের পূর্বে লণ্ডনে অগুনতি ভারতীয় নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি করত। তাদের জন্য হোটেল, বোর্ডিং হৌস তো ছিলই, ডাল-রুটি, মাছ-ভাত খাওয়ার জন্য রেস্তোরাঁও ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অধিক।

বাদবাকি সমস্ত কন্টিনেন্টে ছিল মাত্র দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্যারিসের র্যু দ্য সমোরারের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও বার্লিনের 'হিন্দুস্থান হৌস'।

লণ্ডন ভারতীয় ছাত্রদের সম্বন্ধে উদাসীন কিন্তু বার্লিন ভারতীয়দের খাতির করত। তাই অর্থাভাব সত্ত্বেও 'হিন্দুস্থান হৌস' কায়ক্লেশে যুদ্ধ লাগা পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। একদিক থেকে দেখতে গেলে 'হিন্দুস্থান হৌস' নাৎসি আন্দোলনের চেয়েও প্রাচীন কারণ ১৯২৯-এ হৌসের যখন পত্তন হয় তখনো হিটলার বার্লিনে কল্কে পান নি।

সেই 'হিন্দুস্থান হৌসে'র এক কোণে বাঙালীদের একটা আড্ডা বসত। সে-আড্ডার ভাষাবিদ সূয্যি রায়, লেডি-কিলার পুলিন সরকার, বেটোফেনভক্ত মদনমোহন গোস্বামী বার্লিন সমাজের অশোক-স্তম্ভ কুতুব মিনার হয়ে বিরাজ করতেন। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা। 'হিন্দুস্থান হৌসে'র ভিতরে বাহিরে তাঁর প্রতিপত্তি কতটা তা নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করি নি কারণ চাচা ছিলেন বয়সে সকলের চেয়ে বড়, দানে খয়রাতে হাতিম-তাই আর সলা-পরামর্শে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

এঁদের সকলকেই লুফে নেবার জন্য বার্লিনের বিস্তর ড্রইং-রুম খোলা থাকা সত্ত্বেও এঁরা সুবিধে পেলেই 'হিন্দুস্থান হৌসে' এসে আড্ডা জমাতেন। এ-স্বভাবটাকে বাঙালীর দোষ এবং গুণ দুইই বলা যেতে পারে।

আড্ডা জমেছে। সূয্যি রায় চুকচুক করে বিয়ার খাচ্ছেন। লেডিকিলার পুলিন সরকার চেস্টনাট্ ব্রাউন আর ব্রুনেট্ চুলের তফাৎটা ঠিক কোন্ জায়গায় তাই নিয়ে একখানা থিসিস ছাড়ছে, চাচা গলাবন্ধ কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে চোখ বন্ধ করে আপন ভাবনা ভেবে যাচ্ছেন এমন সময় আড্ডায় সবচেয়ে চ্যাংড়া সদস্য, রায়ের

Suman_ahm@yahoo.com

'প্রতেজে' বা 'দেশের ছেলে' গ্রাম-সম্পর্কে ভাগ্নে গোলাম মৌলা এসে তার মামার পাশে বসল। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা—লাস্ট ট্রেন মিস্ করলে কয়েক মিনিটের তরে মানুষ যে-ভাব নিয়ে বোকার মত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা সেই রকম।

রায় শুধালেন, 'কি রে, কি হয়েছে? প্রেমে পড়েছিস?'

গোলাম মৌলা বড্ড লাজুক ছেলে। বছর সতর হয় কি না হয়, বাপ কট্টর খেলাফতি, ছেলেকে কি দেশে কি বিলেতে ইংরেজের আওতায় আসতে দেবেন না বলে সেই অল্প বয়সেই বার্লিন পাঠিয়েছেন। 'সূয্যিমামা' না থাকলে সে বহুকাল আগেই বার্লিন ছেড়ে পালাত। কথা কয় কম, আর বড়দের ফাইফরমাস করে দেয় অনুরোধ বা আদেশ করার আগেই।

বলল, 'আমার ল্যাণ্ডলেডি আর তার মেয়েতে কি ঝগড়াটাই না লেগেছে যদি দেখতেন। মা নাচে যাচ্ছে, কিছুতেই মেয়েকে নিয়ে যাবে না। মেয়ে বলছে যাবেই।'

রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়ের বয়স কত রে?'

'চল্লিশ হয় নি বোধ হয়।'

'মেয়ের?'

'আঠারো হবে।'

রায় বললেন, 'তাই বল। এতে তোর এত বেকুব বনার কি আছে রে? মা মেয়ে যদি একসঙ্গে নাচে যায় তবে মায়ের বয়স ভাঁড়াতে অসুবিধা হবে না?'

মৌলা বলল, 'কি ঘেন্না! মেয়েটাও দেমাক করে বলছিল, সে থাকলে নাকি মায়ের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আমি ভাবলুম, রাগের মাথায় বলছে, কিন্তু কী ঘেন্না, মায়ে মেয়ে এই নিয়ে লড়াই! মৌলার বিহ্বলতা কেটে গিয়েছে আর তার জায়গায় দেখা দিয়েছে তেতো-তেতো ভাব।

আড্ডা তর্কাতর্কির বিষয় পেয়ে যেন রথের নারকেলের উপর লাফিয়ে পড়ল। একদল বলে বাচ্চার জন্য মায়ের ভালোবাসা অনুন্নত সমাজেই পাওয়া যায় বেশী, অন্য দল বলে ভারতের একান্ন পরিবার সভ্যতার পরাকাষ্ঠা আর একান্ন পরিবার খাড়া আছে মা-জননীদের দয়ামায়ার উপর। লেডি-কিলার সরকারকে জর্মনরা বলত 'Schuerzenjaeger' অর্থাৎ 'এপ্রন-শিকারী', কাজেই সে যে মা মেয়ে সকলের পক্ষ নিয়ে লড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি, আর গোঁসাই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের মা যশোদার কাছে মা-মেরির মাদন্নারূপ নিতান্ত পানসে।

রায় তর্কে যোগ দেন নি। কথা কাটাকাটি কমলে পরে বললেন, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? হবে হবে, কলকাতা বোম্বাই সর্বত্রই আস্তে আস্তে মায়ে মেয়ে রেষারেষি আরম্ভ হবে।'

তখন চাচা চোখ মেললেন। বললেন, 'সে কি হে রায় সায়েব? তুমিও একথা

বললে? তার চেয়ে কথাটা পাল্টে দিয়ে বলো না কেন, জর্মনিতেও একদিন আর এ-লড়াই থাকবে না। এখনকার অবস্থা তো আর স্বাভাবিক নয়। বেশীর ভাগ ল্যাণ্ডলেডিই বিধবা, আর যাদের বয়স ষোলর উপরে তারাই বা বর জোটাবে কোত্থেকে? আরো বহুদিন ধরে চলবে কুরুক্ষেত্রের শল বিধবার রোদন। ১৪-১৮টা কুরুক্ষেত্রের চেয়ে কম কোন্ হিসেবে?

গোঁসাই বললেন, কিন্তু—

চাচা বললেন, 'তবে শোনো।'

কর্নেল ডুটেন্‌হফারের বাড়ি ছাড়ার বৎসর খানেক পরে হঠাৎ আমাকে টাকা-পয়সা বাবদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। তখনকার দিনে বার্লিনে পয়সা কামানো আজকের চেয়েও অনেক বেশী শক্ত ছিল। মনে মনে যখন ভাবছি ধন্নাটা কোন্ চাকরি নিয়ে শুরু করব, অর্থাৎ ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুটে অনুবাদকের, খবরের কাগজে কলামনিস্টের, না ইংরেজি ভাষার প্রাইভেট ট্যুটরের এমন সময়ে ফ্রলাইন ক্লারা ফন্ ব্রাখেলের সঙ্গে দেখা। আমি একটা অত্যন্ত নচ্ছার রেস্তোরাঁ থেকে বেরুচ্ছি, তিনি তাঁর মের্ৎসেডেজ্ হাঁকিয়ে যাচ্ছেন। গাড়িতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাইনার ইডিয়ট, কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছ নাকি, এরকম প্রলেতারিয়া রেস্তোরাঁয় লবাব—পুত্তুর কি ভেবে?'

তোমরা জানো, আমাকে 'ক্লাইনার ইডিয়ট' অর্থাৎ 'হাবাগঙ্গারাম' বলার অধিকার ক্লারার আছে।'

আড্ডা ঘাড় নাড়িয়ে যা জানতে চাইল তার অনুবাদ এককথায়, —'বিলক্ষণ।'

চাচা বললেন, 'ততদিনে আমার জর্মন শেখা হয়ে গিয়েছে। উত্তর দিলুম ডাকসাঁইটে কবিতায়,

'কাইনেন্ ট্রোপ্‌ফ্‌যেন্ ইন্ বেষার্ মের,
উন্ট্ ডাস্ বয়টেল্ শ্লাপ্ উন্ট্‌লের।'

গেলাসেতে নেই এক ফোঁটা মাল আর।
ট্যাক ফাঁকা মাঠ, বেবাক পরিষ্কার॥'

ক্লারা বললেন, 'পয়সা যদি কামাতে চাও তবে তার বন্দোবস্ত আমি করে দিতে পারি। আমার পরিচিত এক 'হঠাৎ নবাবের' ছেলের যক্ষ্মা হয়েছে। একজন সঙ্গীর দরকার। খাওয়া-থাকা তো পাবেই, মাইনেও দেবে ভালো। ওরা থাকে রাইন-ল্যাণ্ডে বার্লিনের তুলনায় গরমে সাহারা।'

আমি রাজী হলুম। দু'দিন বাদ টেলিফোনে চাকরি হয়ে গেল। হানোফার হয়ে কলন পৌঁছলুম।'

মৌলা শুধাল, 'যেখান থেকে 'ও দ্য কলন' আসে?'

"হ্যাঁ, কিন্তু দাম এখানে যা, কলনেও তা। তারপর কলনে গাড়ি বদল করে বন্ন্, বন্ন থেকে গোডেসবের্গ। রাইন নদীর পারে। স্টেশনের চেহারাটা দেখেই জানটা তর্ হয়ে গেল। ভারী ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব। ছোট্ট শহরখানির সঙ্গে জড়িয়ে মড়িয়ে এক হয়ে আছে। গাছপালায় ভর্তি—বার্লিনের তুলনায় সোঁদর বন।

'হঠাৎ-নবাবই' বটে। না হলে জর্মনির আপন খাসা মের্ৎসেডেজ থাকতে রোল্‌স্ কিনবে কেন? ড্রাইভার ব্যাটাও উর্দি পরেছে মানওয়ারি জাহাজের এ্যাডমিরালের।

কিন্তু কর্তা-গিন্নীকে দেখে বড় ভালো লাগল। 'হঠাৎ-নবাব' হোক আর যাই হোক আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য দেখি দেউড়ির কাছে লনে বসে আছেন। খাতির যত্নটা যা করলেন, আমি যেন কাইজারের বড় ব্যাটা। দু'জনাই ইয়া লাশ—কর্তা বিয়ার খেয়ে খেয়ে, গিন্নী হুইপট্ ক্রীম গিলে গিলে। কর্তার মাথায় বিপর্যয় টাক আর গিন্নীর পা দু'খানা ফাইলেরিয়ায় ফুলে গিয়ে আগাগোড়া কোলবালিশের মত একাকার। দু'জনেই কথায় কথায় মুচকি হাসেন—ছোট্ট মুখ দু'খানা তখন চতুর্দিকে গাদা গাদা মাংসের সঙ্গে যেন হাতাহাতি করে কোনো গতিকে আত্মপ্রকাশ করে, এবং সে এতই কম যে তার ভিতর দিয়ে দাঁতের দর্শন মেলে না।

জিরিয়ে জুরিয়ে নেওয়ার পর আমি বললুম, 'এইবার চলুন, আপনাদের ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।' তখন কর্তা গিন্নীকে ঠেলেন, গিন্নী কর্তাকে। বুঝতে পারলুম ছেলের অসুখে তারা এতই বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন যে সামান্যতম কর্তব্যের সামনে দু'জনেই ঘাবড়ে যান—পাছে কোনো ভুল হয়ে যায়, পাছে তাতে করে ছেলের রোগ বেড়ে যায়।

যদি জানা না থাকত যে যক্ষ্মায় ভুগছে তাহলে আমি কার্লকে ওলিম্পিকের জন্য তৈরী হতে উপদেশ দিতুম। কী সুন্দর সুগঠিত দেহ—যেন গ্রীক ভাস্কর শাস্ত্র মিলিয়ে মেপেজুপে প্রত্যেকটি অঙ্গ নির্মাণ করেছেন, কোনো জায়গায় এতটুকু খুঁত ধরা পড়ে না আর সানবাথ নিয়ে নিয়ে গায়ের রঙটি আমাদের দেশের হেমন্তের পাকাধারেন রঙ ধরেছে, চোখ দুটি আমাদেরি শরতের আকাসের মত গভীর আসমানি।

ঘরে আরেকটি প্রাণী উপস্থিত ছিল, নিতান্ত সাদামাটা চেহারা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী—রোগীর নার্স। গিন্নী আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদেরি শহর স্টুটগার্টের মেয়ে, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কার্লের সেবার ভাবনা আমাদের এতটকুও ভাবতে হয় না। আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।'

'একে নিয়েই আমার অভিজ্ঞতা।'

লেডি-কিলার সরকার বলল, 'কিন্তু বললেন যে নিতান্ত সাদামাটা।'

রায় বললেন, 'চোপ।'

চাচা কোনো কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'অভিজ্ঞতাটা এমনি মর্মন্তুদ যে সেটা

আমি চটপট বলে ফেলি। এ জিনিস ফেনিয়ে বলার নয়।

মেয়েটির নাম সিবিলা। প্রথম দর্শনে নার্সদের কায়দামাফিক গম্ভীর সরকারি চেহারা নিয়ে টেম্পারেচারের চার্টের দিকে এমনি ভাবে তাকিয়েছিল যেন চার্টখানা হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে সে সেটাকে খপ করে ধরে ফেলবে। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই টের পেলুম, সে কার্লকে যত না নিখুঁত সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার চেয়ে ঢের বেশী প্রাণরস যোগাচ্ছে হাসিখুশী, গালগল্প দিয়ে। সাদামাটা চেহারা—কিন্তু সেটা যতক্ষণ সে অন্যের প্রতি উদাসীন ততক্ষণই—একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে চোখমুখ যেন নাচতে থাকে, ড্যাবডেবে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে-রকম ধারা হয়। কারো কথা শোনার সময়ও এমন ভাবে তাকায়, মনে হয় যেন চোখ দিয়ে কথা গিলছে। তার উপর গানের ফোয়ারা তার ছিল অন্তহীন ; —গ্যোটে, হাইনে, ম্যোরিকে, র‍্যুকের্টের কথা, বেটোফেন, ব্রামস, শুমান, মেণ্ডেলজোনের সুর দিয়ে গড়া যে-সব গান সে কখনো কার্লের জন্য চেঁচিয়ে, কখনো আপন মনে গুনগুনিয়ে গেয়েছে তার অর্ধেক ভাণ্ডারও আমি অন্য কোনো এমেচারের গলায় শুনি নি।

কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরেই লক্ষ্য করলুম, কথা বলার মাঝখানে সিবিলা আচমকা কেমন ধারা আনমনা হয়ে যায়, খানার টেবিলে হঠাৎ ছুরি কাঁটা রেখে দিয়ে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আর প্রায়ই দেখি অবসর সময়ে রাইনের পারে একা একা বসে ভাবছে। দু-একবার নিতান্ত পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছি—সিবিলা কিন্তু দেখতে পায় নি। ভাবলুম নিশ্চয় প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কখন, আর কার সঙ্গে?

এমন সময় একদিন গিন্নী আমার খাঁটি খবরটা দিলেন। ভদ্রমহিলা নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়েই আমাকে সব কিছু বললেন, কারণ তাঁর স্বামী কার্লের অসুখের ব্যাপারে এমনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে গিন্নী খবরটা তাঁর কাছে ভাঙতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

সিবিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং অবিবাহিতা। পাঁচ মাস। আর বেশীদিন চলবে না। পাড়ায় কেলেঙ্কারি রটে যাবে।

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয় নি। আমি গিন্নীকে বললুম, 'সিবিলা চলে গেলেই পারে।'

গিন্নী বললেন, 'যাবে কোথায়, খাবে কি? এ-অবস্থায় চাকরি তো অসম্ভব, মাঝখান থেকে নার্সের সার্টিফিকেটটি যাবে।'

আমি বললুম, 'তা হলে কর্তাকে না জানিয়ে উপায় নেই।'

গিন্নীর আন্দাজ ভুল ; কর্তা খবরটা শুনে দু'হাত দিয়ে মাথার চুল ছেঁড়েন নি, রেগেমেগে চেল্লাচেল্লিও করেন নি। প্রথমে ডেকে পাঠালেন আমাকে। বললেন,' সিবিলার সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা না বলে উপায় নেই। কিন্তু আমি মনিব, সে কর্মচারী এবং ব্যাপারটা সঙ্গিন। আপনার মত কেউ যদি মধ্যস্থ থাকে তবে বড় উপকার হয়।

অথচ জিনিসটা আপনার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর হবে বলে আপনাকে অনুরোধ করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আমি রাজী হলুম।

সিবিলা টেবিলের উপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদল। কর্তা-গিন্নী দু'জনই খাঁটি লোক, সিবিলাকে এ বিপদ থেকে কি করে উদ্ধার করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করলেন অনেক কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তার কারণটাও আমি বুঝতে পারলুম। এদিকে বিচক্ষণ সংসারী লোক পরিস্থিতিটা ঠাণ্ডা মাথায় কাবুতে আনার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে গ্যোটে-হাইনের স্নেহ-প্রেমের কবিতায় ভরা, অনুভূতির ভাপে-ঠাসা জালে-পড়া সবৎসা সচকিতা হরিণী। ইনি বলছেন, 'পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাল ছেঁড়ো' ; ও বলছে, 'ছোঁড়াছুঁড়ি করলে বাচ্চা হয়ত জখম হবে।'— ইনি জিজ্ঞেস করছেন, 'বাচ্চার বাপ কে?' ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বোঝাচ্ছে, 'তাতে কোনো লাভ নেই, সে বিবাহিত ও অত্যন্ত গরীব।'

বুঝলুম, সিবিলার মনস্থির, সে মা হবেই।

কেঁদে কোঁদে টেবিলের একটা দিক ভিজিয়ে ফেলেছে।

চর্চা স্পর্শকাতর বাঙালী কাজেই তাঁর গলায় বেদনার আভাস পেয়ে আড্ডার কেউই আশ্চর্য হল না।

চাচা বললেন, 'দেশে আমার বোন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে বাড়ি ফিরেছে। মা খুশী, বাবা খুশী। দু'দিন আগে নির্মম ভাবে যে-বোনের চুল ছিঁড়েছে তার জন্যে তখন কাঁচা পেয়ারার সন্ধানে সারা দুপুর পাড়া চষি। তার শরীরের বিশেষ যত্ন নেওয়ার কথা উঠলে সে মিষ্টি হাসে—কি রকম লজ্জা, খুশী আর গর্বে মেশানো। ছোট বোনরা কাঁথা সেলাই করে, আর বাবার বন্ধু বুড়ো কবরেজ মশায় দু'বেল্য গলা খাঁকারি দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন।

আর এ-মেয়েও তো মা হবে।

থাক সে-সব কথা। শেষটায় স্থির হল যে কিছুই স্থির করবার উপায় নেই। উপস্থিত সিবিলা কাজ করে যাক, যখন নিতান্তই অচল হয়ে পড়বে তখন তাকে নার্সিঙ-হোমে পাঠানো হবে। আমি পরে কর্তাকে বললুম, 'কিন্তু বাচ্চাটার কি গতি হবে সে কথাটা তো কিছু ভাবলেন না।' কর্তা বললেন, 'এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। বিপদ-আপদ কাটুক, তখন বাচ্চার প্রতি সিবিলার কি মনোভাব সেইটে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।'

প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিবিলা কাজ করেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তার গান-গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমার বোন এমনিতে গান গাইত না। সে শেষের দিকে গুন্ গুন্ করতে আরম্ভ করেছিল।

বাচ্চা হল। আহা, যেন একমুঠো জুঁই ফুল।

কিন্তু তখন আরম্ভ হল আসল বিপদ। বাচ্চাকে অনাথ আশ্রমে দিতে সিবিলা কিছুতেই রাজী হয় না। বলে, কোনো পরিবারে যেন সে আশ্রয় পায়। কিন্তু এরকম পরিবার পাওয়া যায় কোথায়? অনুসন্ধান করলে যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব তা নয় কিন্তু জর্মনির সে দুর্দিনে, ইনফ্লেশনের গরমিতে মানুষের বাৎসল্যরস শুকিয়ে গিয়েছে—আর তার চেয়েও বড় কথা, অতটা সময় আমাদের হাতে কই।

রোজ হয় ফোন, নয় চিঠি। নার্সিঙ-হোম্ বলে, সিবিলাকে নিয়ে যাও। এখানে বেড্ দখল করে সে শুধু আসন্ন-প্রসবাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

এদিকে কর্তা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা দিয়ে এজেন্সির লোককে লাগানো, আপন বন্ধুবান্ধবদের কাছে অনুসন্ধান কিছুই বাদ দেন নি। আমাকে পর্যন্ত দু'তিনবার কলন, ড্যুসেলডর্ফ হয়ে আসতে হল। নার্সিঙ-হোমের তাড়া খেয়ে কর্তার ভূঁড়ি গিরে আষ্টেক কমে গেল। কী মুশকিল!

সব কিছু জানতে পেয়ে তখন সিবিলাই এক আজব প্যাঁচ খেলে আমাদের দম ফেলার ফুর্সৎ করে দিল। নার্স তো বটে, এমনি এক বিদঘুটে ব্যামোর খাসা ভান করলে যে পাঠশালার মিটমিটে শয়তান আর হলিউডের ভ্যাম্পে মিললেও ফল এর চেয়ে ভালো ওতরাতো না ক্লুট হামসুন বলেছেন, 'প্রেমে পড়লে বোকা বুদ্ধিমান হয়ে ওটে, বুদ্ধিমান বোকা হয়ে যায়।' সিবিলার মত ভিতরে বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার মঙ্গলের জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠলো।

এমন সময় কর্তা—কারবারে যাকে বলে ভালো 'পার্টি'র খবর পেলেন। অগাধ পয়সা, সমাজে উঁচু শিক্ষিত পরিবার কিন্তু আমাদের এজেন্ট বলল 'পার্টি'—অর্থাৎ ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী—কড়া শর্ত দিয়েছেন যে সিবিলা এবং আমাদের অন্য কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পাবে না, এবং কথা দিতে হবে যে জানবার চেষ্টা করবে না, যে কারা সিবিলার বাচ্চাকে গ্রহণ করলেন। এ শর্ত কিছু নূতন নয়, কারণ কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত নয় যে সিবিলা যদি একদিন হঠাৎ তার বাচ্চাকে ফেরত চেয়ে বসে তখন নানা বিপত্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর কিছু না হোক বাচ্চাটা যদি জানতে পেরে যায় তার আসল মা কে তাহলেই তো উৎকট সঙ্কট।

কর্তার মত ব্যবসায়ের পাঁজে পোড়-খাওয়া ঝামাও এ-প্রস্তাব নিয়ে নার্সিঙ-হোমে যান নি। সব কিছু চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন। দু'দিন পরে উত্তর এল, সিবিলা রাজী।

মনস্থির করতে সিবিলার দুদিন লেগেছিল। সে আটচল্লিশ ঘন্টা তার কি করে কেটেছিল, জানি না। বাড়িতে আমরা তিনজন নিঃশব্দে লাঞ্চ-ডিনার খেয়েছি, একে অন্যে চোখাচোখি হলেই একসঙ্গে সিবিলার দ্বিতীয় প্রসব বেদনার কথা ভেবেছি। আইন মানুষকে এক পাপের জন্য সাজা দেয় একবার, সমাজ কতবার, কত বৎসর ধরে দেয় তার সন্ধান কোনো কেতাবে লেখা নেই, কোনো বৃহস্পতিও জানেন না।

ট্রান্ডক কলে ট্রাঙ্ক কলে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করা হল। কর্তা সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবেন। 'পার্টি'র ওয়েট নার্স (ধাই) বাচ্চার জন্য ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবে। সিবিলা স্টুটগার্টের ট্রেন ধরলে পর কর্তা বাচ্চাটিকে সেই ধাইয়ের হাতে সঁপে দেবেন। 'পার্টি' কড়াক্কড় জানিয়েছেন, সিবিলা যেন ওয়েট নার্সকেও না দেখতে পায়।'

যে-দিন সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে যাবার কথা সে-দিন দুপুর বেলা কার্লের গলা দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠল। ছ' মাস ধরে টেম্পারেচর, স্প্যুটাম কাবুতে এসে গিয়েছিল, এ-পি বন্ধ ছিল, তারপর হঠাৎ সাদা দাঁতের উপর কাঁচা রক্তের নিষ্ঠুর ঝিলিমিলি। আমরা তিনজনাই সামনে ছিলাম। কর্তারই কি একটা রসিকতায় হাসতে গিয়ে ব্যাপারটা ঘটল। ছেলের মন ভালো রাখবার জন্য ভদ্রলোক অনেক ভেবেচিন্তে রসিকতাখানা তৈরী করেছিলেন। অবস্থাটা বোঝো। আমি তাঁকে হাত ধরে নিজের ঘরে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটলুম।

আমাকে কর্তা গিন্নী এতদিন ধরে যে-আদর আপ্যায়ন করেছেন তার বদলে যদি সে-সন্ধ্যায় আমি কর্তার বদলে সিবিলাকে নিয়ে স্টেশনে না যেতুম তাহলে নিছক নিকম-হারামি হত। হার্ট নিয়ে কর্তা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। আমি নার্সিঙ-হোম যাচ্ছি শুনে আমার হাতে সিবিলার ছ' মাসের জমানো মাইনে দিলেন। গিন্নী নিজের থেকে আরো কিছু, আর আপন হাতে বোনা বাচ্চার জন্য একজোড়া মোজা দিলেন।

গোডেসবের্গ ছোট শহর। কিন্তু নার্সিঙ-হোম থেকে স্টেশন যেতে হলে দুটি বড় রাস্তার উপর দিয়ে যেতে হয়। আমি স্টিয়ারিঙে, সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে পিছনে। ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে সঙ্গে নিই নি, এবং ট্রেনটাও বাছা হয়েছে রাত্রের, যাতে করে খামখা বেশী জানাজানি না হয়। তার মাইনে তাকে দিয়েছি; মোজার মোড়ক যখন সে খুলল তখন আমি সে দিকে তাকাই নি।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি—ঝাঁকুনিতে কাঁচা বাচ্চার অনিষ্ট হয় কি না হয় তা তো জানি নে। থেকে থেকে সিবিলা আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি ঠিক জানেন যাঁদের বাড়িতে আমার বুবি যাচ্ছে তাঁরা ভালো লোক?' আমি আমার সাধ্যমত তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছি আর ভাবছি কর্তা এলেই ভালো হত। তিনি সমস্ত জিনিসটা নিশ্চয়ই আরো গুছিয়ে করতে পারতেন।

সিবিলা একই প্রশ্ন বারে বারে শুধায়, তাঁরা লোক ভালো তো? আমি ভাবছি যদি শুধায় তাঁরা ভালো আমি কি করে জানলুম তা হলেই তো গেছি। আমার কেন কর্তারও তো সে-সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু যখন সিবিলা সে প্রশ্ন একবারও শুধালো না তখন বুঝতে পারলুম, তার কাছে অজানার অন্ধকার আধা-আলোর দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশী কাম্য হয়ে উঠেছে। জেরা করলে যদি ধরা পড়ে যায়—যদি ধরা পড়ে যায় যে আমার উত্তরে রয়েছে শুধু ফাঁকি? তখন? তখন সে মুখ ফেরাবে কোন্ দিকে,

কোথায় তার সান্ত্বনা?

সিবিলা বলল, 'গাড়ি থামান একটু দয়া করে। ঐ তো খেলনার দোকান। আমার বুবির তো কোনো খেলনা নেই।' তাই তো, কর্তা, আমি দু'জনেই এদিকে একদম খেয়াল করি নি। কিন্তু এক মাসের শিশু কি খেলনা বোঝে?

এক গাদা খেলনা নিয়ে সিবিলা গাড়িতে ঢুকল।

দশ পা যেতে না যেতেই সিবিলা বলল, 'ঐ তো জামা কাপড়ের দোকান। বুবির তো ভালো জামা নেই। গাড়ি থামান।' থামলুম। এবার বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে সে দোকানে ঢুকলো, জিনিস বয়ে আনতে অসুবিধে হতে পারে ভেবে আমিও সঙ্গে গেলুম।

দোকানি যেটা দেখায় সেটাই কেনে। কোনো বাছবিচার না, দাম জিজ্ঞেস করা না। দোকানি পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'বুবির এখন বাড়ন্ত বয়স, জামাগুলো দু'দিনেই ছোট হয়ে যাবে না?'

বলে করলুম পাপ। সিবিলা বলল, 'ঠিক তো', আর কিনতে আরম্ভ করল সব সাইজের জামা, পাতলুন, মোজা, টুপি। আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষটায় বললুম, 'ফ্রলাইন সিবিলা, ট্রেনের বেশী দেরি নেই।' সিবিলা বলল, 'চলুন।'

আরো দশ পা। সিবিলা হুকুম করল 'থামান।'

এবারে কি কিনল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দোকানপাট একটা একটা করে বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সিবিলা বলে, 'থামান', সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আর ছুটে গিয়ে দোকানিকে দরজা বন্ধ করতে বারণ করে। যে-দোকান দেখে বন্ধ হচ্ছে, ছুটে যায় সে-দোকানেরই দিকে। ছুটোছুটিতে চুল এলোথেলো হয়ে গিয়েছে, পাগলিনীর মত এদিক ওদিক তাকায়—সে একাই লড়বে সব দোকানির সঙ্গে। কেন? একদিনের তরে তারা দোকানগুলো দু'মিনিট বেশী খোলা রাখতে পারে না? আমি বার বার অনুনয় করছি, 'ফ্রলাইন সিবিলা, বিট্টে বিট্টে, প্লীজ, প্লীজ, জায়েন জী ফেরনুন্‌ফ্‌টিষ্, এ কি করেছেন? গাড়ি ধরব কি করে?' সিবিলা কোনো কথায় কান দেয় না। আমার মাথায় কুবুদ্ধি চাপল, ভাবলুম একটু জোরজার করি। বললুম, 'এত সব জিনিসের কি প্রয়োজন?'

চকিতের জন্য সিবিলা বাঘিনীর ন্যায় রুখে দাঁড়াল। হুঙ্কার দিয়ে 'কী?' বলেই থেমে গেল। তারপর হঠাৎ ঝরঝর করে চোখের জল বেরিয়ে এল।

চাচা বললেন, 'আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। খোদার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলুম সিবিলার পরীক্ষা সহজ করে দেবার জন্য।'

তারপর আমি আর বাধা দিই নি। যায় যাক্ দুনিয়ার বেবাক ট্রেন মিস্ হয়ে। বিশ্বসংসার যদি তার জন্য আটকা পড়ে যায় তবে পড়ুক। আমি বাধা দেব না।

বোধ হয় টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। সিবিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের কাছে আমার আর কোনো পাওনা আছে?' আমি বললুম, 'না, কিন্তু আপনার যদি

প্রয়োজন হয় তবে আমি দিতে পারি।' বলল, 'পাচটা মার্ক দিন, একখানা আ-বে-ৎসের বই কিনব।'

এক মাসের শিশু বই পড়বে।

গাড়ির পিছনটা জিনিসে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। সিবিলা বাচ্চাকে নিয়ে আমার পাশে বসল। তার হাতের বেলুন উড়ে এসে আমার স্টিয়ারিঙে বাধা দিচ্ছে। সিবিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

স্টেশনে যখন পৌঁছলুম তখন গাড়ি আসতে কয়েক মিনিট বাকি। গোডেসবের্গ ছোট স্টেশন, ডাকগাড়ি দু'মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না। আমি বাচ্চাটাকে নেবার জন্য হাত বাড়ালুম, কোনো কথা না বলে। সিবিলা বলল, 'প্ল্যাটফর্মে চলুন, গাড়ি ছাড়লে পর—।' আমি কোনো কথা না বলে এগিয়ে চললুম।

পোর্টারই দেখিয়ে দিল কোন জায়গায় দাঁড়ালে সেকেণ্ড ক্লাস ঠিক সামনে পড়বে। আমি সিবিলাকে আরো পঞ্চাশটি মার্ক দিলুম।

সিবিলা সিগনেলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের অন্ধকারের মাঝখানে তার দৃষ্টি ডুবে গিয়েছে। তার কোলে বুবি। ভগবানের জুঁই একরাতেই শুকিয়ে যায়, সিবিলার জুঁই যেন অক্ষয় জীবনের আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমুচ্ছে।

সিবিলা আমার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিল। এক মুহূর্তের তরে সব কিছু ভুলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ বাচ্চা কোলে নিতে জানেন; আমাদের পুরুষেরা তো পারে না।'

আমি আরাম বোধ করলুম। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পোর্টার সিবিলার সুটকেশ তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ সিবিলা সেই পাথরের প্ল্যাটফর্মে হাঁটু গেড়ে আমার দু'হাঁটু জড়িয়ে হাহা করে কেঁদে উঠল। সে কান্নায় জল নেই, বাষ্প নেই। বিকৃত কণ্ঠে বলল—

'আমায় কথা দিন, ঈশ্বরের শপথ, কথা দিন আপনি বুবির খবর নেবেন সে ভালো আছে কি না। মা মেরির শপথ,—না, না, মা মেরির না—আপনার মায়ের শপথ, কথা দিন।'

আমি আমার মায়ের নামে শপথ করলুম। 'পার্টি' যা বলে বলুক, যা করে করুক। পোর্টার হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সিবিলাকে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিল।

গাড়ির গায়ে চলার পূর্বের কাঁপন লেগেছে। এমন সময় আমার আর সিবিলার কামরার মাঝখান দিয়ে একটি মহিলা ধীরে সুস্থে ছোট্ট একটি ছেলের হাত ধরে ধরে চলে গেলেন। সিবিলা দোরে দাঁড়িয়েছিল, তাদের লক্ষ্য করল কি না বলতে পারি নে, হঠাৎ দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।

আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা কেড়ে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

'আমি বাধা দিলুম না।'

For More Books visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only $19.95USD from http://www.scp-solutions.com/order.html